Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-I, October 2023, Page No.74-90
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

‘কবিতা ও গল্পের দর্পণে নজরুল-চৈতন্যে দাম্পত্য প্রেমের মধুমিশ্রা’

ডক্টর কমল আচার্য

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাবিদ্যালয়, সাব্রুম, দক্ষিণ ত্রিপুরা,ভারত

Abstrac:t

In the light of the deep mind of the all-powerful, gifted creator is waiting for the manifestation of the various creations. I assume that the creator is Nazrul. Nazrul is a highly passionate romantic rebel poet. His achievement is in poetry. But when differently wrote his fiction stories or created essay literature, it can be observed with surprise, The nature of his poet's soul has been revealed in the prose literature and essays. In the consonance of various feelings, two different aspects of the same creator have been created, the soul of the creator, the brother of the same consciousness, which is interesting. It is from this curiosity that the matter is taken up in the title of the essay ‘Kabita o Galper Darpane Nazrul Premer Madhumishra’. Among Nazrul's various stories, especially conjugal love stories, special attention is drawn to ‘Swamihara’ ‘ Padmagokhra’ and ‘Rakshasi’. While reading these three stories, it seems that sometimes Nazrul, a sad and sad poet, pained by love, is exposed and sometimes the poet's traditional protestant rebel is being caught, but that rebellion is also ‘Nari’,` Bibagini’ ‘Pujarini’, ‘Dolanchampa’, ‘Bisherbanshi’, ‘Pap’, ‘Anamika’, ‘E Mor Ahankar’. etc. in poetry. The poet will think that people have become similar in the sweet peace. It is here that the coexistence of the poet's and the storyteller's consciousness is traced. And the wonderful uniformity of this sweet co-existence is endowed with honeydew.

Keywords: Madhumishra, Muhyaman, Nairboktikta, Bimur.

“শিল্পী আমি আমি কবি
তুমি আমার আঁকা ছবি,
আমার লেখা কাব্য তুমি, আমার রচা গান
চাইবো নাকো পরাণ ভরে করে যাব দান।“

নজরুল-চৈতন্যে প্রেমানুভূতির এই হল ষোলআনা পরিচয়। তাঁর গল্প-কবিতায় বহুবর্ণিল প্রেম- বৈচিত্র থাকলেও তাঁর শিল্পী আত্মার প্রেম-ভাবনার এখানেই মূল পরিণতি। আসলে মানবিক প্রায় সমস্ত অনুভূতির মত প্রেম অনুভূতিও জটিল ও পরস্পর বিরোধী। ব্যক্তিগত অনুভূতি সঞ্জাত প্রেম, প্রকৃতির অনুষঙ্গে এসে তাই নর-নারীর বিচিত্র অনুভূতির বাহন হয়ে ধরা দেয় বিচিত্ররূপে। ব্যক্তিগত অনুভূতি যেহেতু পরিবর্তনশীল

সমাজসত্তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাই পরিবর্তনশীল সমাজের সঙ্গে সামাজিক ব্যক্তির প্রেমানুভূতির রেখা ও রং পরিবর্তিত হয়ে যায়। তাই দেখা যায়, বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের রোমান্টিক প্রেম পরাধীন ঊনিশ শতকে এসে স্বদেশ প্রেমের আবেগময়তায় মিশে যেতে। বৈষ্ণবীয় প্রেমের অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনা বা কবিয়ালদের গানে প্রেমের ইতর প্রকাশ, পাশ্চাত্য প্রেম সাধনার রূপ-বিহ্বলতা ও রহস্য সন্ধানের পথে যাত্রা করেছে। আবার বিংশ শতাব্দীর ফ্রয়েডীয় প্রবৃত্তির প্রবল লিবিডো প্রভাব ব্যক্তিগত অনুভূতিকে নানা জটিল ভাবগ্রন্থি ও জীবনের নানা দুশ্ছেদ্য প্রশ্নসংকুলতার আবরণ উন্মোচনে নব দিগন্ত নির্দেশ করেছে। কিন্তু যুগে যুগে প্রেমের এই পালা বদলের রূপভেদ ঘটলেও প্রেম তাঁর শাশ্বত মৌল স্বভাবটি বজায় রাখে নানা বৈচিত্র্য নিয়েই।

নজরুল বিংশ শতাব্দীর কবি। অতীব আবেগপ্রবণ রোমান্টিক কবি। তাই তাঁর ব্যক্তিগত প্রেমানুভূতিও নিঃসঙ্গতা, বিষণ্ণতা ও বেদনা-বিহ্বলতায় মুহ্যমান। বিভিন্ন কবিতা, কাব্যগীতি, প্রবন্ধ, নাটক ও উপন্যাসের মতো তাঁর গল্পেও প্রেম-চেতনা বিচিত্র রূপের বিরহ চেতনায় ব্যথাতুর। প্রশ্ন জাগতে পারে, নজরুলের কিছু পূর্বেও সমসাময়িক অনেক কবিই তো রোমান্টিক। প্রেম-বিরহের বেদনা-বিলাসও তাঁদের কাব্যে অদৃশ্য নয়। তবে নজরুলের প্রেম-চেতনার আলাদা মাত্রা কোথায়? আসলে, রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেই তথাকথিত অ্যান্টিরোমান্টিক কল্লোল গোষ্ঠীর পদযাত্রা শুরু। আর স্বয়ং নজরুল তো কল্লোল গোষ্ঠীরই একজন হয়ে ঝরিয়েছেন তাঁর বিদ্রোহের বাণী। তিনি তাঁর একহাতে বাজান রণতূর্য, কিন্তু আর এক হাতে বাজিয়ে যান বাঁকা বাঁশের বাঁশরীও। সেই বাঁশি তো সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা বঙ্গ প্রকৃতিরই দান। তাই তাঁর এক হাতের রণতূর্য যতই বিদ্রোহের রণ হুঙ্কার শোনাক না কেন, অন্য হাতের বাঁকা বাঁশের বাঁশরীতে শুনিয়েছে কিন্তু বিরহী প্রেমিক কবি নজরুলের প্রেম-বিরহের ফুকার ধ্বনি। আর সেই ধ্বনি আরো করুণ হয়ে উঠেছে উদাসী কবির প্রেম-বিরহের অনুভবে। তাঁর গল্পগুলিতেও কবি আত্মার সেই প্রতিফলন ঘটেছে। ফলে গল্পের ভাষা ও পরিণতি হয়ে উঠেছে প্রেম চেতনার ব্যথানিষিক্ত মাধুর্যে ব্যঞ্জনাময়।

‘নিবাও বাসনাবহ্নি নয়নের নীরে’—রবীন্দ্রনাথের অনুভবের মধ্যে প্রেমের সৌন্দর্যানুভূতির এই যে স্বপ্ন মাধুর্য প্রকাশ পেয়েছে, যুদ্ধোত্তর যুগের তরুণ কবিদের নতুন দৃষ্টিতে দেখা জীবনের ধ্যান-ধারণা তার থেকে পাল্টে গেল। প্রেমের ভদ্র ও শালীন চেহারার পরিবর্তে ‘কল্লোল’-‘কালিকলম’-‘প্রগতির’ পাতায় মানুষের কামনা- বাসনা নতুন জীবনের নতুন আন্দোলনে পেল নতুন রূপ ও গতি। কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ঘোষণা করেন—‘প্রেম ও ধর্ম জাগিতে পারে না বারটার বেশি রাতি।’ অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তের মনে সংশয় দেখা দিল যে, প্রেমের মধুর তিমিরে মগ্ন থাকার মধ্যে কোথাও যেন কিছু গ্লানি আছে। শরীরী রক্ত মাংসের মূলেও একটি বিষণ্ণতার স্পর্শে জীবনানন্দের প্রেম হয়েছে নিরুস্তেজ। ‘জ্ঞানের বিহনে প্রেম নেই’—সেখানে। বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রেম-চেতনায় এসেছে দুঃসাহসিক ভোগবাদ। এঁদের অগ্রজ কবি মোহিতলাল মজুমদার তো দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করলেন:

“ত্যাগ নহে, ভোগ, ভোগ, তারি লাগি সেইজন বলীয়ান
নিঃশেষে ভরি লইবারে পারে, এত বড় যার প্রাণ।
যেজন নিঃস্ব, পঞ্জর তলে নাই যার প্রাণ-ধন,
জীবনের এই উৎসবে তার হয়নি নিমন্ত্রণ।“[১]

সংস্কারমুক্ত দেহস্পর্শমুখর কামনার ছবিতে নজরুলও আঁকলেন তাঁর প্রেম-চেতনার স্বরূপ:

"উদ্বেলিত বুকে মোর অতৃপ্ত যৌবন-সুধা উগ্র কামনা,
জন্ম তাই লভি বারে বারে,
না পাওয়ার করি আরাধনা...
যা কিছু সুন্দর হেরি করেছি চুম্বন,
যা কিছু চুম্বন দিয়া করেছি সুন্দর
সে সবার মাঝে যেন তব হরষণ
অনুভব করিয়াছি-ছুঁয়েছি অধর
তিলোত্তমা, তিলে তিলে।" [২]

নজরুলের কবিতায় দেহকামনার এরূপ প্রকাশ মোহিতলালের কিছু কিছু কবিতাকে স্মরণ করালেও মোহিতলালের প্রেম-চেতনায় রয়েছে দার্শনিক ভাব গভীরতায় প্রজ্ঞার ছাপ। সেখানে তাঁর কবিতা গভীর জলের মতো গম্ভীর। কিন্তু, বয়ঃসন্ধি তারুণ্যের অত্যধিক আবেগ-উচ্ছ্বাসে নজরুলের প্রেম যেন ঝরনার ধারার মতোই চঞ্চল, চপল। অথচ সেই প্রেম যেন অবহেলিত ঝরা শিউলির মতোই ব্যথাতুর। আসলে প্রেমের আবেগঘন মানবীয় কামনারসের প্রতি শ্রদ্ধাবান কবি নজরুল। তাই কবি তাঁর মানস-প্রিয়াকে বলতে পারেন:

"চাইনা তোমায় স্বর্গে নিতে, চাই এ ধূলাতে
তোমার পায়ে স্বর্গ এনে ভুবন ভোলাতে।
ঊর্ধ্বে তোমার—তুমি দেবী
কি হবে মোর সেরূপ সেবি
চাইনা দেবীর দয়া, যাচি প্রিয়ার আঁখিজল
একটু দুখে অভিমানে নয়ন টলমল।"[৩]

-নজরুলের গল্পগুলিকে এই প্রেম চেতনাই বিবিধ রূপে, বিভিন্ন আবেগঘন রোমান্টিক প্রকাশে প্রভাবান্বিত করেছে। এখানে নায়ক-নায়িকা প্রেমের ক্ষেত্রে হৃদয়াবেগ সর্বস্ব। প্রেমের সম্পর্কসূত্রে আবদ্ধ হওয়া গ্লানিকর, তা নজরুলের নায়ক- নায়িকারা বিশ্বাস করে না। তাদের কাছে প্রেম হলো আত্মদান আর আত্মত্যাগ। এই ত্যাগে তৃপ্তি আছে। চোখের ও ঝরায় এই ত্যাগ, কিন্তু ধুয়ে মুছে দেয় অন্তরের গ্লানি। খুঁজে দেয় প্রেমের অমর রূপ। মানব স্বভাবের বৈশিষ্ট্য হলো এই প্রেমের স্মৃতি রোমন্থন। আর তাই বিরহের একটা টান টান ব্যথাই যেন মনকে করে তোলে উদাস-বিধুর। অথচ, এর মধ্যেই রয়েছে তৃপ্তির মাধুর্য। আধুনিক কবি নজরুলের সঙ্কটময় যুগ-চৈতন্য এখানে আধুনিক গল্পকার নজরুলে উৎকীর্ণ হয়ে উঠেছে।

নজরুলের গল্পে তাঁর এই প্রেম-মাধুর্যের প্রকাশ আমরা চারটি স্বাদে পাই:

পর্বাঙ্গ (ক) : ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমে দেহাতীত প্রেমের মাধুর্য।
পর্বাঙ্গ (খ) : দাম্পত্য প্রেমের স্বরূপ ও নজরুলের বিদ্রোহী চেতনার একদিক ।
পর্বাঙ্গ (গ) : ব্যক্তিপ্রেম : বিরহী নজরুল।
পর্বাঙ্গ (ঘ) : আদর্শায়িত প্রেম।

নজরুলের আঠারোটি গল্প ও বহুবিধ কাব্য, কবিতা আর কাব্যগীতে বহুবর্নিল যে প্রেম ধরা পড়েছে তার বিচিত্রতা লক্ষ্য করা গেছে এইরূপ:

1) ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমে দেহাতীত প্রেমের মাধুর্য
2) ব্যক্তি প্রেম: বিরহী নজরুল
3) দাম্পত্য প্রেম: নজরুলের বিদ্রোহী চেতনার ভিন্নরূপ
4) আদর্শায়িত প্রেম

নজরুল-চৈতন্যে এই নানারূপী প্রেম মাধুর্য একই স্রষ্টার দুই ভিন্নাঙ্গিকের সৃষ্টি গল্প ও কবিতার সহাবস্থান করে যেন হয়ে উঠেছে চৈতন্যের সহোদর। আর এই জন্যেই প্রবন্ধটির শিরোনাম করার প্রয়াস হয়েছে কবিতা ও গল্পের দর্পণে নজরুল -চৈতন্যে প্রেমের (দাম্পত্য প্রেমের) মধুমিশ্রা। আমাদের লক্ষ্য দাম্পত্য প্রেমের মধুমিশ্রা।

"দিয়া বেদনার পরে বেদনা
নাথ একি এ বিপুল চেতনা
তুমি জাগালে আমার রোদনে, অন্ধে দেখালে বিশ্ব-দ্যোতনা
ওগো নিষ্ঠুর মোর! অশুভ ও রূপ তাই এত বাজে বুকে আসি
ওগো সুন্দর সন্ন্যাসী।"

'স্বামীহারা' দাম্পত্য প্রেমের কাব্যিক গল্প। যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত মুমূর্ষু মায়ের পিতৃহীনা একটি গৃহবধু বেগম গল্পের নায়িকা। স্নেহময়ী শাশুড়ি ও মানবতাবাদের পূজারী এম.এ পাশ স্বামী আজিজের হাতে বেগমকে সঁপে দিয়ে, বেগমের মা মারা গেল। তখন ঐ মা-বাপ হারা অনাথা বেগমের শূন্য হৃদয়কে পূর্ণ করে তুলেছিল তার স্বামীর ভালবাসা। কিন্তু যত ভালবাসা ততই পরমাদ-এর আশঙ্কা নিয়েও বেগম নিজেকে ধন্য মনে করে ভাবে:

"তাঁর ঐ বিশ্বগ্রাসী ভালবাসা যখন চোখের আলোর জ্যোতির মতো হয়ে ফুটে উঠত, তখন শুধু ভাবতাম প্রেমে মানুষ কত উচ্চ হতে পারে। এর এতটুকু ছোঁয়ায় সে কী কোমলতার স্নিগ্ধ পুতসুরধনী বয়ে যায় সারা বিশ্বের অন্তরের অন্তর দিয়ে। দেবতা বলে কি কোনো কথা আছে? কখনো না, মানুষই যখন এই রকম উচ্চ হতে পারে, অতল ভালবাসায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তলিয়ে দিতে পারে, নিজের অস্তিত্ব বলে কোনো কিছু একটা মনে থাকে না-সে দেখে, সুন্দর আর আনন্দময়, তখনই মানুষ দেবতা হয়।"[৪]

এইভাবে স্বামীর শুদ্ধ প্রেমে বেগম জগতের সকল কিছুকেই সুন্দর দেখে। স্বামীর প্রেম আর দেবতার করুণাকে সে দেখতে শুরু করে অভিন্ন করে। স্বামীকে মনে হয় প্রেমিকযোগী। আর স্বামীর শুদ্ধ প্রেমের ছোঁয়ায় সেও হয়ে ওঠে যেন প্রেম পূজারিণী। স্বামীর অত্যধিক ভালবাসা এখন তার মনকে যুগপৎ আনন্দে আর শঙ্কায় ভরিয়ে তোলে। নজরুলের কবিতায় দেখি এই একই ভাবের আশ্চর্য রূপায়ণ-

"করেছ পথের ভিখারিণী মোরে/কে গো সুন্দর সন্ন্যাসী?
কোন বিবাগীর মায়া-বন মাঝে বাজে/ঘর ছাড়া তব বাঁশী
ওগো সুন্দর সন্ন্যাসী?

তব প্রেম-রাঙা ভাঙা জোছনা
হের শিশির অশ্রুলোচনা,
ঐ চলিয়াছে কাঁদি বরষার নদী/গৈরিক রাঙা বসনা।
ওগো প্রেম-মহাযোগী, তব প্রেম লাগি নিখিল বিবাগী পরবাসী।
মম একা ঘরে নাথ দেখেছিনু তোমা/ক্ষীণ দীপালোকে হীন করি,
হেরি বাহির আলোকে অনন্তলোকে/একি রূপ তব মরি মরি!
দিয়া বেদনার পর বেদনা
ওগো সুন্দর সন্ন্যাসী।
নাথ একি এ বিপুল চেতনা তুমি জাগালে আমার রোদনে, অন্ধে দেখালে বিশ্ব – দ্যোতনা
ওগো নিঠুর মোর! অশুভ ও রূপ তাই এত বাজে বুকে আসি,
ওগো সুন্দর সন্ন্যাসী।“[৫]

-বেগমের এই সন্ন্যাসীতুল্য স্বামী দেব-সেবায় আত্মনিবেদনের মতোই কলেরা ও বসন্ত রোগীর সেবায় নিজেকে সঁপে দিল। একদিন দেবতার পায়ে তার প্রাণটি অর্ঘ্যস্বরূপ উৎসর্গীকৃত হলো। বেগমের শূন্য ঘরে আঁধার ঘনালো। স্বামীর মৃত্যুর অনতিকালের মধ্যেই বেগম লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত হ’ল শ্বশুরবাড়ি থেকে। তার সঙ্গে পেল ‘নেকা’ করে পুনর্বার সংসার পাতার হৃদয়বিদারী উপদেশ। কিন্তু যে স্বামীর পবিত্র প্রেম তার হৃদয়ে দেবতার আশীর্বাদের মতো শতদল হয়ে প্রস্ফুটিত, সেই হৃদয়কে তো সে আর অন্য কারো কামনার কাছে সঁপে দিতে পারে না:

“যাঁরা বাধ্য হয়ে অন্নবস্ত্রাভাবে বা আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে ওরকম করে, ভালবাসার অপমান করে, তাদের কি হৃদয় বলে কোনো একটা জিনিস নাই? তাহলেও তাদের ক্ষমা করা যেতে পারে, কিন্তু যারা শুধু কামনার বশবর্তী হয়ে পবিত্রতাকে, নারীত্বকে ওরকম মাড়িয়ে চলে যায়, তাদের কোথাও ক্ষমা নেই। ভালবাসা স্বর্গের এমন পবিত্র ফুলকে কামনার শ্বাসে যে কলঙ্কিত করে, তার উপযুক্ত বোধহয় এখনও কোনো নরকের সৃষ্টি হয় নাই।“[৬]

বেগমের প্রেমে এই যে নিষ্ঠা ও একাগ্রতা গল্পকার নজরুল ফুটিয়ে তুলেছেন, তাই কবি নজরুলের ‘পূজারিণী’ কবিতার এই কয়টি পঙ্ক্তির মধ্যে একই ভাবসাদৃশ্যবাহী হয়ে উঠেছে:

“প্রাণ নিয়া একি নিদারুণ খেলা খেলে এরা হায়,
রক্ত ঝরা রাঙা বুক দলে অলক্তক পরে এরা পায়।
এরা দেবী, এরা লোভী, এরা চাহে সর্বজন প্রীতি।
ইহাদের তরে নহে প্রেমিকের পূর্ণ পূজা, পূজারীর পূর্ণ সমর্থন,
এ পূজা হেরি ইহাদের ভিরুবুকে তাই জাগে এত সত্য-ভীতি।
নারী নাহি হতে চায় শুধু একা কারো,
এরা দেবী, এরা লোভী, যত পূজা পায় এরা চায় তত আরো।“[৭]

নারীর প্রেমের নামে কামনার কদর্যতা সম্পর্কে বেগম সচেতন। সেও নারী। কিন্তু উদাস সন্ন্যাসী স্বামীর শুদ্ধ প্রেমের পরশমণির স্পর্শে তারও কামনায় যেন ঐশ্বরিক প্রেমের শুদ্ধতা জাগে। তাই স্বামীর অপ্রতিহত

শুদ্ধ প্রেমের মাধুর্যকে মাড়িয়ে চলার মতো শক্তি তার নেই। প্রেমের এই পবিত্র, শাশ্বত সত্যকে বাঁচিয়ে রাখতেই বেগম কেরোসিন ঢেলে পুড়ে, বিষ খেয়ে, জলে ডুবে—কোনো পদ্ধতিতেই আত্মহত্যা করতে পারে না। কেননা, সে ভাবে, যে আত্মা তার স্বামীর পবিত্র ভালবাসায় অভিষিক্ত হয়েছে, তাকে হনন করার অধিকার তার নেই। নেই তার প্রেমের অপমান করার দুঃসাহসও। তাইতো সে আজ স্বামীর কবরের পাশেই ঘুরে ঘুরে (লৌকিক দৃষ্টিতে উন্মাদিনী) দিন কাটায়, আর তার প্রেম-স্মৃতি রোমন্থন করে।

নজরুলের ব্যক্তি জীবনে দেখা যায়, প্রথমা পত্নী নার্গিসের সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্ক ভেঙে গেলে অচিরেই নার্গিস হয় অন্যের ঘরণী। কিন্তু দীর্ঘকাল পর নজরুলের ভরা যশ ও প্রতিষ্ঠার কালে, নার্গিস নজরুলকে তাদের দাম্পত্য প্রেমের ভাঙনে অভিযুক্ত করে চিঠি দিয়েছিল। সঙ্গে এও প্রকাশ করেছিল যে, নজরুল রাজি থাকলে সে আবার তার ঘরণী হতে পারে। নচেৎ সে আত্মহত্যারও হুমকি দেয়। কবি তার চিঠির জবাব দেন তাঁর শিল্পীমনের সংবেদন থেকে-

'দেখা? না-ই হ'ল এ ধূলির ধরায়'। প্রেমের ফুল এ ধুলি তলে হয়ে যায় ম্লান, দগ্ধ, হতশ্রী। তুমি যদি সত্যই আমায় ভালবাস, আমাকে চাও, ওখানেই থেকেই আমাকে পাবে...আত্মহত্যা মহাপাপ, এ অতি পুরাতন কথা হলেও পরম সত্য। আত্মা অবিনশ্বর, আত্মাকে কেউ হত্যা করতে পারে না। প্রেমের সোনার কাঠির স্পর্শ যদি পেয়ে থাক, তাহলে তোমার মত ভাগ্যবতী কে আছে? তারই মায়াস্পর্শে তোমার সকল কিছু আলোয় আলোময় হয়ে উঠবে। দুঃখ দিয়ে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে গেলেই সেই দুঃখের আসান হয় না। মানুষ ইচ্ছা করলে সাধনা দিয়ে, তপস্যা দিয়ে, ভুলকে ফুল রূপে ফুটিয়ে তুলতে পারে।'[৮]

দাম্পত্য প্রেমের মাধুর্য সম্পর্কে নজরুলের শিল্পী আত্মার এই যে শাশ্বত অনুভব, 'স্বামীহারা' গল্পের নায়িকা বেগমের জীবন উপলব্ধিতে পায় তারই প্রতিষ্ঠা। স্বামীর শুদ্ধ প্রেমকেই বেগম করে তার অবশিষ্ট জীবন পথের পাথেয়। বিরহ শূন্যতায় হৃদয় হাহাকার করে উঠলেও বেগমের প্রেমের গৌরব তাকে জীবনের রসদ যোগায়। নজরুলের গানে এই চেতনাই প্রকাশিত:

'তুমি কি গিয়াছ ভুলে?
তোমার চরণ স্মরণ চিহ্ন আজো মোর নদী কূলে
মুছিল না প্রিয়, মুছিল না তার বুকে সে লিখিলে লেখা,
মাঝে বহে স্রোত, দু'কূল জুড়িয়া চরণ স্মরণ রেখা
বন্যার ঢল, জোয়ার, উজান আসে যায় ফিরে ফিরে
ও চরণরেখা মুছিল না মোর বালুচরে নদীতীরে॥'[৯]

শুধু স্বামীর প্রেম-স্মৃতিকে আশ্রয় করে বেগম বেঁচে আছে। আর মানুষের গঞ্জনায় যখন কবরে গিয়ে প্রিয়তমের কাছে দুঃখের আর্তি জানায়, তখন হতাশা, বুকফাটা বেদনার জ্বালা তাকে কাঁদায়:

"কেন মেঘের ছায়া আজি চাঁদের চোখে?
মোর বুকে মুখ রাখি, ঝড়ের পাখি সম কাঁদে ও কে?
গভীর নিশীথের কণ্ঠ জড়ায়ে, শ্রান্ত কেশভার গগনে ছড়ায়ে

হারানো প্রিয়া মোর এল কি লুকায়ে
আমার একা ঘরে, ম্লান আলোকে।।
গঙ্গায় চিতা তার নিভেছে কবে,
মোর বুকে সেই চিতা আজো জ্বলে নীরবে
স্মৃতির চিতা তার নিভিবে না বুঝি আর
কোন সে জনমে, কোন সে লোকে।।”[১০]

কবরের নিষ্প্রাণ পাষাণের বুকেও বেগমের স্বামী প্রেমের ভালবাসা বেদনার তাজমহল হয়ে বিরাজ করবে। ঘোষণা করবে তাঁর প্রেমের গৌরব গাথা,:

“সুন্দর কঠিন তুমি পরশ পাথর
তোমার পরশ লভি হইনু সুন্দর॥“
‘পারি নাই বাছা মোর, হে প্রিয় আমার
দুই বিন্দু দুগ্ধ দিতে।’

কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের মতো নজরুলও বাৎসল্য বা অপত্য প্রেমকে বিচিত্র রসের আস্বাদন দিয়েছেন তাঁর ‘পদ্মগোখরো’ গল্পে। এই গল্পে মাতৃহৃদয়ের অমোঘ মমত্ব মানবেতর প্রাণী পদ্মগোখরো শিশুর মধ্যে আশ্চর্য স্ফূর্তি লাভ করেছে। অবশ্য এই মানবেতর প্রাণী নিয়ে গল্প রচনা বাংলা ছোটগল্পের জগতে নতুন নয়। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ‘আদরিণী’, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘মহেশ’, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নারী ও নাগিনী’ এবং ‘কালাপাহাড়’ গল্পে পশু ও মানুষের ভালবাসা মিলে মিশে এক হয়ে যায়। ‘পদ্মগোখরো’ গল্পটি এই সকল গল্পের মতো হয়তো শৈল্পিক সফলতা লাভ করেনি, কিন্তু এই গল্পে দাম্পত্য প্রেমের শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশে, স্ত্রী জোহরার সর্প শিশুর প্রতি মাত্রাতিরিক্ত অপত্য প্রীতির ফলে যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে, তাতে গল্পটি হয়ে উঠেছে ভিন্ন আস্বাদে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই গল্পে নারীর মাতৃত্বের শক্তির কাছে যেভাবে দুটি গোখরো শিশু বশীভূত হয়, তাতে স্নেহ ও ভালবাসার প্রকাশে মানুষ আর বিষধর প্রাণীর মধ্যে বুঝি কোনো পার্থক্য থাকে না। এই প্রতীকী ব্যঞ্জনার মধ্যেই নিহিত রয়েছে ‘পদ্মগোখরো’ গল্পের শৈল্পিক সফলতা।

‘পদ্মগোখরো’ গল্পের নায়িকা জোহরা। বাদশাহী আশরফীতে পূর্ণ পেতলের কলসীর কণ্ঠ জড়িয়ে ধন পাহারারত পদ্মগোখরোদ্বয়কে মাতৃদুগ্ধ দিয়ে জোহরা করে বশীভূত। পয়মন্ত বধূর প্রাপ্ত এই ধনে মীর পরিবারের আর্থিক অবস্থার দ্রুত উন্নতি ঘটে। জোহরার স্বামী কন্ট্রাকটারি করে আর কলকাতায় কয়লার ব্যবসা করে আশাতীত লাভ করতে থাকে। উদার প্রেমিক স্বামী আরিফের সংসার আনন্দ আর সুখে ভরে ওঠে। কিন্তু এই সুখের সংসারে যেন দেবতার অভিশাপের মতোই প্রবেশ করে পদ্মগোখরো শিশুদ্বয়ের প্রতি জোহরার অত্যধিক পুত্রবাৎসল্য।

বাস্তুসাপ মারতে নেই। এই লোক বিশ্বাসের প্রশ্রয়ে সর্প শিশু দু’টি বিচরণ করতে থাকে বাড়িতে। জোহরার হাতের স্নেহ পেয়ে আর দুধ খেয়ে তারা হয় জোহরার একান্ত অনুগত। ক্ষিধে পেলেই তারা খাবার জন্য জোহরার পা জড়িয়ে দুধের আকুতি জানায় খেতে না দিলে অভিমান করে। এমনকি রাতে বিছানায় জোহরার পাশে শুয়ে জোহরার শরীরের উষ্ণতা নিয়েই তারা নিদ্রা যায় নিশ্চিন্তে। জোহরাও তাদের আদরে

সোহাগে ঘুম পাড়িয়ে মেটায় তার সদ্য মৃত যমজ পুত্রের অতৃপ্ত বাৎসল্য। কিন্তু সর্পদ্বয়ের ওপর এই অধিক বাৎসল্য প্রীতি স্বভাবতই স্বামী আরিফের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। অত্যধিক সম্প্রীতিতে জোহরাও ক্রমে স্বামীর প্রতি অমনোযোগী হয়। স্ত্রীর এই মনোভাবকে আরিফ তার নিজের প্রতি স্ত্রীর প্রেম প্রদর্শনায় অবহেলা বলেই মনে করে। আর এই ভুল বোঝাবুঝিকে কেন্দ্র করেই শেষ পর্যন্ত সর্পদ্বয়ের প্রতি জাগে আরিফের ঈর্ষা। শুরু হয় 'স্বামী-স্ত্রী'তে মান-অভিমানের মৃদু টানাপোড়েন। আর এই টানা- পোড়েনের রেশ বিস্তারিত হয়-শেষ পর্যন্ত জোহরাকে পিত্রালয়ে পাঠানোর সিদ্ধান্তে।

স্বামী-স্ত্রীর ভুল বোঝাবুঝির অবসানে অনেক ঘাত-সংঘাতের জটিল স্তর অতিক্রম করে জোহরা আবার ফিরলো শ্বশুরবাড়ি। অবশ্য তখনও জোহরার মধ্যে সর্পশিশু দুটির প্রতি তার অপত্য স্নেহকামনা ছিল তীব্র। এতদিনের অনুপস্থিতিতে সেই অপত্য স্নেহ যেন আরো দ্বিগুণ তীব্রতা পায়। স্বামীর পাশে শুয়ে জোহরা তার মৃত খোকাদের (জোহরার আশঙ্কা, এতদিন তার অনুপস্থিতিতে তার সর্প সন্তানদ্বয় বোধহয় অনাহারে মারা যায়) স্বপ্নে দেখে। ঘুমের মধ্যেই 'খোকা! খোকা!' বলে চিৎকার করে ওঠে সে। তারপর ঘুম ভাঙলে প্রদীপ জ্বেলে নীরবে নিভৃতে সে তার খোকাদের খুঁজতে গেল কবরস্থানে-

"পাশাপাশি দুইটি ছোট কবর, যেন দুটি যমজ ভাই গলাগলি করিয়া শুইয়া আছে। মাতা ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল, খোকা! খোকা! কে তোদের এত ফুল দিয়েছে বাবা। খোকা।" গল্পকার জানাচ্ছেন,- "মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিল, না ঐ কবর ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পড়িয়াছিল জানে না, জাগিয়া উঠিয়াই জোহরা দেখিল, তাহার বুকে কুণ্ডলী পাকাইয়া সেই পদ্মগোখরা দ্বয়।"

"জোহরা উন্মত্তের মতো চিৎকার করিয়া উঠিল, খোকা, আমার খোকা, তোরা এসেছিস, তোদের মাকে মনে পড়ল? জোহরা আবেগে সাপ দু'টিকে বুকে চাপিয়া ধরিল, সর্পদুটিও মালার মতো তাহার কণ্ঠ বাহু জড়াইয়া ধরিল।"[১১]

পুত্রহারা জোহরা, আর নজরুলের দারিদ্রদীর্ণ জীবনে প্রিয়পুত্র বুলবুলের অকাল মৃত্যুজনিত বেদনা-বিক্ষত গভীর বেদনানুভূতি যেন একাত্ম হয়ে ফুটে ওঠে এই কয়টি পঙ্ক্তিতে:

"হয়ে মোর শিশু
জাগিয়া কাঁদিছ ঘরে,
খাওনিক কিছু কালি হতে সারাদিন তাপস নিষ্ঠুর
কাঁদ মোর ঘরে নিত্য তুমি ক্ষুধাতুর।
পারি নাই বাছা মোর, হে প্রিয় আমার,
দুই বিন্দু দুগ্ধ দিতে।"[১২]

গল্প কাহিনীর চূড়ান্ত মোড় ফেরার দৃশ্য, কাব্যিকতা, দারিদ্র একই সঙ্গে প্রকাশিত হয় 'পদ্মগোখরো' গল্পে। গল্পের পরিণতিতে আমরা দেখি, সর্পশিশুর দংশনে জোহরার পিতা মারা যায় এবং পিতার লাঠির আঘাতে মৃত্যু হয় সর্পশিশু দুটিরও। আর গ্রামময় রটে যায়-মীর বাড়ির নতুন বৌ দুটি সাপ প্রসব করে মৃত্যুবরণ করেছে। উপন্যাসোপম বড় গল্পের এই কাহিনীর পরিণতিতে নজরুল অবিশ্বাস্য অতি প্রাকৃতের

সমাবেশ ঘটিয়েও ‘পদ্মগোখরো’ (গল্পের বিষয় বাস্তবসম্মত না হলেও) গল্পটিকে তিনি বিচিত্র পরিবেশানৈপুণ্যে আস্বাদ্য করে তুলতে পেরেছেন।

গল্পটিকে বিশ্বাসযোগ্য করতে গিয়ে নজরুল যথেষ্ট কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন, সর্প শিশুদ্বয়ের প্রতি জোহরার অতিরিক্ত স্নেহ বাৎসল্যের কারণ গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য বলেছেন, এক বছরের মধ্যে জোহরার যমজ সন্তান হয়ে মারা গেছে। জোহরার বিশ্বাস যে, মৃত সন্তান দুটি যেন সর্পরূপ ধারণ করে তাকে ছলনা করতে এসেছে। একবার তো দেখা গেল জোহরা স্বপ্নের মধ্যে দেখে, তার মৃত সন্তানেরা যেন বহুদিন ক্ষুধার্ত থেকে মায়ের কাছে এসে বলেছে:

“মাগো, বড় ক্ষিদে, কতদিন আমাদের দুধ দাওনি। আমরা কবরে শুয়ে, আর উঠতে পারিনে। একটু দুধ। মা। একটু দুধ। বড় ক্ষিদে। খোকা! খোকা! বলিয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া জোহরা জাগিয়া উঠিল।“[১৩]

সাপের সঙ্গে মানুষের রহস্যময় সম্পর্কের উপকথা গ্রাম বাংলায় যুগ যুগ ধরে প্রচলিত। নজরুল এই উপকথাকে গল্পরূপ দিতে গিয়ে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যে, অতিপ্রাকৃতের সমাবেশ থাকা সত্ত্বেও গল্পটি ভীতিকর হয়ে ওঠেনি কিংবা হয়ে ওঠেনি অতিবাস্তব। নজরুল এই বিষয়টিকে গল্পে স্বকীয়তার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। তার সঙ্গে বাৎসল্য রস সংযোজিত করে দাম্পত্য প্রেমের ঘাত-সংঘাতের দারুণ বাস্তবতা ফুটিয়ে তুলেছেন। মায়ের সন্তান স্নেহ যদি অকৃত্রিম হয়, তবে সেই স্নেহতে ভয়ঙ্কর সম্পর্কেও বশে আনা যায়, পারা যায় সর্পের কৃতজ্ঞতা আদায় করে নিতেও। এই অকৃত্রিম ক্ষমতা-মাখা স্নেহ-শক্তি নজরুল অপূর্ব দাম্পত্য প্রেমের মাধুর্যে প্রকাশ করেন। বাংলা গল্প সাহিত্যে নজরুলের এরূপ ভিন্নাস্বাদী সংযোজন আমাদের সত্যিই মুগ্ধ করে। অবশ্য, রচনার বহিরঙ্গে শান্ত নৈর্ব্যক্তিকতা অথচ অন্তরঙ্গে ব্যক্তিত্বের চরম প্রক্ষেপ, যে কথাসাহিত্যের মূল চাহিদা-তা তেমন দানা বাঁধিয়ে তুলতে পারেননি গল্পকার নজরুল তাঁর ‘পদ্মগোখরো’ গল্পে। সমালোচকের মতে-

‘একজন লেখক যত চরিত্র এবং যা কিছু ঘটনাকেই আবিষ্কার করুন না – তাঁর প্রতিটি চরিত্র তাঁরই নিজস্ব বর্ণে রঞ্জিত হয়ে থাকবে, -তাঁর প্রতিটি ঘটনাকে দেখা হবে একান্ত তাঁরই perspective থেকে।’[১৪]

এদিক থেকে বিচার করলে আমরা দেখি, নজরুলের ছন্নছাড়া উদাসী জীবনে তাঁর অপত্য স্নেহ বুভুক্ষু মনটিই বিদ্রোহী নাগশিশুর দৃষ্টিকোণ হয়ে ধরা দিয়েছে- ‘পদ্মগোখরো’ গল্পে। আর সেখানে কবি নজরুলের ব্যক্তি-আত্মা গল্পকার নজরুলের perspective-এ মিশে হয়ে উঠেছে চৈতন্যের সহোদর:

“সহসা থমকি দাঁড়ানু আমার সর্পিল-পথ বাঁকে
ওগো নাগমাতা, বিষ জর্জর তব গরজন ডাকে।
কোথা সে অন্ধ অতল পাতাল বন্ধ গুহার তলে
নির্জিত তব ফণা-নিঙড়ানো গরলের ধারা গলে,
পাতাল-প্রাচীর চিরিয়া তোমার জ্বালা ক্রন্দন চুর
আলোর জগতে এসে বাজে যেন বিষ-মদ চিক্কুর।
আঁধার পীড়িত রোষ-দোদুল সে তব ফণা ছায়া দোল
হানিছে গৃহীরে অশুভ শঙ্কা, কাঁপে ভয়ে সুখ-কোল

ধূমকেতু ধ্বজ বিপ্লব রথ সম্ভ্রমে অচপল,
নোয়ালি শির শ্রদ্ধা প্রণত রথের অশ্বদল।
ধূমকেতু ধূম—গহ্বরে যত সাগ্নিক শিশু ফণী
উল্লাসে জয় জয় নাগমাতা হাঁকিল জয়ধ্বনি।
বন্দিল উর-নাগ-নন্দিনী ভেদিয়া পাতাল তল
দুলিল গগনে অশুভ অগ্নি-পতাকা জ্বালা-উজল।
তারপর মাগো কোথা গেলে তুমি, আমি কোথা হনু হারা,
জাগিয়া দেখিনু, আমারে গ্রাসিয়া রাহু রাক্ষস কারা।“[১৫]

অধ্যাপক বন্ধু কাজী মোতাহার হোসেনকে লেখা নজরুলের একটি চিঠিতে নজরুল জানান:

“ছেলেবেলা থেকে পথে পথে মানুষ আমি। যে স্নেহে, যে প্রেমে বুক ভরে ওঠে কানায় কানায় তা কখনো কোথাও পাইনি। -‘বুকের রক্ত চোখের জল হয়ে দেখা’ দেবার আগেই তাকে গলার কাছে প্রাণপণ বলে আটকিয়েছি। একগুণ দুঃখ হলে দশগুণ হেসে তার শোধ নিয়েছি। সমাজ-রাষ্ট্র মানুষ সকলের ওপর বিদ্রোহ করেই তো জীবন কাটল।“

একদিকে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী মন, অন্যদিকে স্নেহ বুভুক্ষু মন নিয়ে নজরুলের মধ্যে যে কবি ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে, তারই অন্তর্গূঢ় চেতনার প্রকাশ ‘পদ্মগোখরো’ গল্পে। নাগশিশু নজরুলের ব্যক্তি জীবনের প্রেম পিপাসু অতৃপ্ত মনটি পদ্মগোখরোদ্বয়ের স্নেহ বুভুক্ষু আচরণের সঙ্গে সঙ্গতিলাভ করেছে। মাতা জোহরার কাছ থেকে পদ্মগোখরো শিশুদ্বয়ের মাতৃস্নেহ প্রাপ্তির কৃতজ্ঞতা, পদ্মগোখরোদ্বয় কর্তৃক তাদের মাতা জোহরার ক্ষতি সাধনে চক্রান্তকারীকেই ছোবল মেরে হত্যা করায় এবং প্রত্যাঘাতে শেষপর্যন্ত নিজেদেরও জীবন উৎসর্গ করার মধ্য দিয়ে বিদ্রোহী স্বদেশপ্রেমী নজরুলের মাতৃঋণ শোধ করার স্বরূপ প্রকাশ পায়। সর্প শিশু দুটির এই আচরণের সঙ্গে অত্যাচারিত স্বদেশ ও তার সমাজের অন্যায় অবিচার সৃষ্টিকারী অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে নাগশিশু নজরুলের প্রতিবাদী বিদ্রোহ যেন সমমাত্রায় অবস্থিত।

আসলে নজরুল প্রধানত কবি-গীতি কবি। তাই তাঁর পদ্মগোখরো গল্পের নায়িকা জোহরা ও পদ্মগোখরো সর্পশিশুদের অপত্য স্নেহ তাঁর সহানুভূতির গভীর অতল স্পর্শতায় গীতিকবিতার স্বভাবধর্মে যেন তাঁরই স্নেহ বুভুক্ষু কবি মনের পরিণতি এনে দিয়েছে। গতানুগতিক মানবেতর প্রাণী সর্পও তাঁর গল্পে, কবি স্বভাবের প্রভাবে নতুন এক শিল্প প্রকরণের জন্ম দিয়েছে। গল্পটির বিষয় ও প্রকরণ স্বভাবী পাঠকের কাছে চিরবিস্ময়। এর কাহিনী, ঘটনা, চরিত্র, কেন্দ্রীয় লক্ষ্য, শেষতম ব্যঞ্জনা, মৃত্যুমুহূর্তে রচনার প্রয়াস, একটানা গল্প বলে যাওয়ার মধ্যে গতির অমোঘতা, নাটকীয়তা এবং মনস্তত্ব--চিরকালের বিস্ময়কে ধরে রাখে।

‘যাহারা আমার বিচার করেছে-ভুল করিয়াছে জানি,
তাহাদের তরে রেখে গেনু মোর বিদায়ের গানখানি ।
হই কলঙ্কী, হোক মোর ভুল, বালুকার বুকে ফুটায়েছি ফুল,
তুমিও ভুলিতে পারিবে সে কথা—হানো যত অবহেলা॥’[১৬]

'প্রত্যেকটি গল্পের নায়ক-নায়িকা বা পার্শ্বচরিত্র লেখকেরই বহুরূপী অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা প্রত্যেকেই নিজেদের মধ্যে সংখ্যাতীত সত্তাকে বহন করে চলেছি। আমাদেরই রোমান্টিকতার তাড়নায় আমরা কোনো সুমধুর প্রেম কাহিনীর নায়ক হয়ে উঠি, আমাদের ভিতরে যে আদিম জিঘাংসা অবদমনের গুহায় নিহিত, সেই ঘাতক নায়ক হয়ে জন্ম নেয়, আমাদের দোলাচল চিত্ততা থেকেই বেরিয়ে আসে বিমূঢ় দার্শনিক প্রিন্স হ্যামলেট: 'To be or not to be that's the question!' আর এই প্রতিটি চরিত্রের সঙ্গে যদি আমরা অভিন্নচেতা না হতে পারি, তাহলে কিছুতেই তাদের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার ঘটবে না। রচনার বহিরঙ্গে শান্ত নৈর্ব্যক্তিকতা, অথচ অন্তরঙ্গে ব্যক্তিত্বের চরম প্রক্ষেপ, কথা সাহিত্যের আসল কৌতুকটি এখানেই।।'[১৭]

এই কৌতুকটির শৈল্পিক প্রকাশ কথাসাহিত্যিক নজরুলের 'রাক্ষুসী' ও 'পদ্মগোখরো' গল্প দু'টিতে আমরা লক্ষ্য করি। এই গল্পদ্বয়ের বহিরঙ্গে রয়েছে শান্ত নৈর্ব্যক্তিকতা। কিন্তু এগুলির অন্তরঙ্গে ফুটে উঠেছে বিদ্রোহী ও মানবধর্মী কবি নজরুলের ব্যক্তিত্বের প্রক্ষেপ।

'রাক্ষুসী' গল্পে নজরুলের প্রেম-চেতনা দাম্পত্য প্রেমের ট্র্যাজিক পরিণতিতে বিচিত্র উপাদানকে আশ্রয় করেছে। সাতচড়ে রা না করা শিবতুল্য স্বামী, দুটি মেয়ে, আর একটি ছেলে নিয়ে বিন্দির সুখের সংসার। স্বামী জন খাটে। বিন্দি নিজেও পরের বাড়িতে কাজ করে। বড় ছেলে আর বড় মেয়েও কাজ করে দু'চার পয়সা সংসারে দিয়ে সাহায্য করে। সব মিলিয়ে বিন্দির সুখের সংসার। স্বপ্ন দেখে সে, বাড়িতে বউ আসবে, জামাই আসবে, তার মাটির ঘরটি আনন্দে 'ইন্দিরপুরী' হয়ে উঠবে। গল্পের পরিণতিতে আমরা দেখি, বিন্দির এই সুখের সংসারে নামে অমাবস্যার অমানিশা। পবিত্র সুখী দাম্পত্য প্রেমে নেমে আসে ঘৃণা আর অবিশ্বাসের অভিশাপ। মদ খাবার বদ অভ্যাস থাকলেও বিন্দির স্বামীর পর নারীতে আসক্তি ছিল না। স্ত্রী বিন্দিকে সে খুবই ভালবাসতো। কিন্তু, সেই শিবতুল্য স্বামীকেই সরল লোক পেয়ে রঘো বাগ্দীর তিন তিনটে বিয়ে করা চরিত্রহীনা মেয়ে বিপথগামী করে। নিজের রোজগারের সমস্ত টাকা, এমনকি বিন্দির গতরখাটা রোজগারের জমা টাকাও চুরি করে তার স্বামী ঐ চরিত্রহীনার পায়ে ঢেলে দেয়। ঠিক হয় তাদের বিয়ে হবে। নিরস্ত করার জন্য বিন্দির সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। যে স্বামী কোনোদিন তার গায়ে হাত তোলেনি, সেদিন সেই-ই তাকে চেলা কাঠ দিয়ে মেরে তার পিঠে রক্ত ঝরালো। এতে যত না শারীরিক, ততোধিক ব্যথা পেল বিন্দি স্বামীর প্রেম হারাবার দুঃখে। এই দুঃখ ও অপমান সহ্য করতে না পারার অতল গহ্বর থেকেই বিন্দির অবচেতন মনে জাগলো স্বামী হত্যার গুপ্ত ইচ্ছা। এখানেই দেখা দিল গল্পকাহিনীর 'টার্নিং পয়েন্ট'। বিন্দি মনে মনে ঠিক করে নিল, যেকোনো মূল্যের বিনিময়েই সে স্বামীকে বিপথগামিতার হাত থেকে রক্ষা করবে। সহধর্মিণী স্ত্রীর যে এটা কর্তব্য। আর এইজন্য যদি নিজ হাতে স্বামীকে খুন করতেও হয়, তাও সে করবে। চললো তার মধ্যে তীব্র মানসিক দ্বন্দ্ব:

'দেবতার মতো লোক সিধা নরকে নেমে যাচ্ছে, এক পা এক পা করে, আর বেশিদূরে নাই। অথচ ফেরার কোনো উপায় নাই। তখন তাকে হত্যা করলে কি পাপ হয়? তাছাড়া আমি তার ইস্ত্রি, আমারও তো একটা কর্তব্য আছে, আমার সোয়ামি যদি বেপথে যায় তো আমি না ফিরালে অন্য কে এসে ফিরাবে? আর সে এইরকম বেপথে গেলে ভগবানের কাছে ধর্মত আমি তো দায়ী। ধর, আমি যদি তাকে এই সময়ে একেবারে শেষ করে ফেলি, তাহলে তার তো আর কোনো পাপ থাকবে না। যত পাপ হবে আমার।'[১৮]

বিন্দি শিক্ষিতা নারী নয়। দাম্পত্য জীবনের কেতাবী আদর্শজ্ঞানও তার নেই। কিন্তু আছে সহধর্মিণীর মর্মবোধ। স্বামীকে ব্যভিচারের পাপ থেকে ফিরিয়ে আনাকে সে স্ত্রীর স্বাভাবিক ধর্ম বলেই মনে করেছে। আর যে শিবতুল্য সরল স্বামীর প্রতি তার প্রেমের ঘাটতি ছিল না, সেই শুদ্ধ প্রেমে কালিমা মাখতে না দেওয়াকেও সে ধর্ম বলেই বুঝেছে। তবে এইসব স্বাভাবিক চিন্তাকে সে দুঃসাহসিক খুনের সিদ্ধান্তে যুক্ত করে অতি আদর্শায়িত প্রেমের বিয়োগান্তক পরিণতিতে উত্তীর্ণ করেছে। এটা সাধারণতঃ অস্বাভাবিক বলেই মনে হয়। কিন্তু মনস্তত্ত্বের জটিল পথের সন্ধান শেষ পর্যন্ত কেইবা দিতে পেরেছে! যে প্রেমিক স্বামী তারই চোখের সামনে দিয়ে ‘আনবাড়ি যায়’, স্বামীর প্রেম-সোহাগ বঞ্চিতা নারীর পক্ষে তখন স্বামীকে খুন করাও যে অস্বাভাবিক কিছু নয় নজরুলের লেখায় তাই বিশ্বাস্য হয়ে উঠেছে। সাধ্বী নারীর স্বামীকে খুন করার মতো দার্শনিক সিদ্ধান্ত আমাদেরকে ভাবলোকের অন্য জগতে নিয়ে যায়-

‘ভগবান, তুমি সাক্ষী রইলে, আমি আমার দেবতাকে নরকে যাবার আগে তাঁর জানটা তোমার পায়ে জবাফুলের মতো উচ্ছগ্য করব, তুমি তাঁর সব পাপ খণ্ডন করে আমাকে শুধু দুখকু আর কষ্ট দাও। আমার তাই আনন্দ।’[১৯]

বিন্দির লৌকিক পতি-প্রেমের এই যে ক্ষত্রোচিত মধুর প্রকাশ, তার সঙ্গে সততার নির্ভীক বলিষ্ঠতা মিলেমিশে যেন এক হয়ে যায় গল্পকারেরই রচিত এই পঙ্ক্তি কয়টিতে:

‘শেষ হ’ল মোর এ জীবনে ফুল ফোটাবার পালা
ওগো মরণ, অর্ঘ্য লহ সেই কুসুমের ডালা।
কাটলো কীটে ঝরল যে ফুল,
শুকালো যে আশার মুকুল,
তাই দিয়ে হে মরণ তোমার গেঁথেছি আজ মালা॥’[২০]

-বিন্দি শেষ পর্যন্ত নিজের হাতে স্বামীকে খুন করে তাকে পাপের, অধর্মের গ্লানি থেকে রক্ষা করে। নিজে মাথা পেতে নেয় দীর্ঘ জেল হাজতের সাজা। দীর্ঘ বছরের বন্দীত্বে এবং অনুশোচনায় ও দুঃখ-দহনে জ্বলে সে হয় শুদ্ধ। ফিরে আসে সংসারে। পুত্র ও পুত্রবধূর সঙ্গে শুরু করে স্বাভাবিক সামাজিক জীবন। কিন্তু অনুশোচনার দহন-জ্বালা তাকে অঝোরে কাঁদিয়ে ফেরায় দিক্-দিগন্তে। সেই গ্রাম, সেই স্বামীর বধ্যভূমি, সেই স্বামীর মৃত্যুকালীন কাতর প্রাণ ভিক্ষার আকুতি- সব ছবি তার চোখে ভেসে ওঠে। স্বামীর করুণ মুখখানি তার অন্তরকে এক গভীর বিরহ ব্যথায় বিষাদগ্রস্ত করে তোলে। হাহাকার করে ওঠে হৃদয়। কিন্তু তবুও তার মনে গর্ব যে, সে যথার্থ স্ত্রীর ধর্ম পালন করেছে। একদিকে স্মৃতির জ্বালা, অন্যদিকে নিজহাতে হত্যা করেও প্রেম-প্রকাশের গর্ববোধে বিন্দি যেন দুঃখ-দহনে জ্বলে হয় তৃপ্ত। তার এই প্রেম মাধুর্যের ভাবটি গল্পকার নজরুল যেভাবে গল্পে চিত্রিত করেছেন, তার ভাব-সাদৃশ্য যেন তাঁরই লেখা এই কাব্যগীতের সুরে একাত্ম হয়ে ওঠে:

“খেলা শেষ হ’ল, শেষ হয় নাই বেলা।
কাঁদিও না, কাঁদিও না তব তরে রেখে গেনু প্রেম-আনন্দ মেলা।।
খেলো খেলো তুমি আজো বেলা আছে,
খেলা শেষ হলে এসো মোর কাছে,

প্রেম যমুনার তীরে বসে রব লইয়া শূন্য ভেলা।
যাহারা আমার বিচার করেছে-ভুল করিয়াছি জানি,
তাহাদের তরে রেখে গেনু মোর বিদায়ের গানখানি।
হই কলঙ্কী, হোক মোর ভুল, বালুকার বুকে ফুটায়েছি ফুল,
তুমিও ভুলিতে পারিবে সে কথা- হানো যত অবহেলা”।।[২১]

জেল থেকে ফিরে বিন্দি এই ভাবের সাগরেই নিজেকে নিমজ্জিত রাখছিল। শান্ত-স্নিগ্ধ জননী হয়েই সে কাটাচ্ছিল সুস্থ সামাজিক জীবন। কিন্তু তাতেও বাদ সাধল সমাজেরই মানুষ। তারা বিন্দির ওপর শুরু করে অত্যাচার। রাস্তার আনাচে কানাচে, পথে-ঘাটে, কাজে-কর্মে বিন্দিকে দেখলেই তারা তার সম্পর্কে কুৎসা রটায়, ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়। এইসব অপমান ও গঞ্জনা দিনের পর দিন সহ্য করতে না পেরে মানসিক ভারসাম্য হারায় বিন্দি। তবে তার চরম জিজ্ঞাসা-

‘এ পাগল হওয়ার দোষটা কার? একটা ভাল মানুষকে খোঁচা মেরে ক্ষেপিয়ে তুললে সে দোষটা কি ভাল মানুষের না যে ভাল মানুষেরা তাকে ক্ষেপিয়ে তোলে তাদের?’[২২]

এই জিজ্ঞাসাই ‘রাক্ষুসী’ গল্পের চরম জিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসাকে কেন্দ্র করেই বিন্দি চরিত্রের করুণ জীবন পরিণতি গভীর ব্যঞ্জনাবহ হয়ে উঠেছে। ছোট গল্পের শিল্প পরিণতিও তাতে অনেকটাই সার্থক হয়ে উঠেছে।

‘যে ব্যথাটাকে আমি আমার মনের মাঝেই চেপে রেখেছিলুম, সেটাকে আবার জাগিয়ে তুলে চোখের সামনে সোজা করে ধরলে তো এরাই।’[২৩]

অন্তরের কালিমা মুছে, সমাজের মূল স্রোতে ফিরে স্বাভাবিক জীবন যাপনের আকাঙ্ক্ষা বিন্দির। সমাজের আর দশজন স্বাভাবিক মানুষের মতো একজন বিভ্রান্ত নারীরও যে স্বতঃস্ফূর্ত সামাজিক আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা প্রয়োজন-মানবতাবাদী গল্পকার নজরুলের এই তো কাম্য। কিন্তু যারা এই মানবিকতাবোধের বিরোধী আচরণে স্বাভাবিক নারীকে অস্বাভাবিক করে, ঠেলে দেয় তাকে চরম একাকীত্বে, সেই অমানবিক আচরণে নজরুল হন প্রতিবাদী। তাঁর এই বিদ্রোহী সত্তাই এখানে প্রতিবাদী বিন্দির চরিত্রে যেন সঞ্চারিত হয়ে যায়। স্বামীর পরকীয়া প্রেমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিণী বিন্দির আবেগাপ্লুত যুক্তিই যেন নজরুলের কবিতায় ঝঙ্কৃত হয়:

“শিখালে কাঁকড় চুড়ি পরিয়াও নারী
ধরিতে পারে যে উদ্ধত তরবারি-
যদি না রহিত অবরোধের দুর্গে হতো না এ দুর্গতি
তুমি দেখালে নারীর শক্তি-স্বরূপ চিন্ময়ী কল্যাণী
ভারত-জয়ীর দর্প নাশিয়া, মুছালে নারীর গ্লানি।“[২৪]

গল্পকার নজরুলও দেখালেন যে, একদিন বিন্দিও ছিল স্বামীর একান্ত অনুগত। ছিল সে সংসার অন্ত-প্রাণ। অথচ সেই বিন্দিই ব্যভিচারী স্বামীকে জীবনের উজ্জ্বল আলোকে ফেরাতে ব্যর্থ হয়ে আবির্ভূতা হয়েছে চিন্ময়ী মূর্তিতে। আসলে, জীবনের উত্থান-পতন আর সমাজ জীবনের রূঢ় বাস্তবতাই তাকে চিনিয়েছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অসংগতিগুলোকে। তাই স্বামী-হত্যার স্বপক্ষে সে দৃঢ়তা নিয়ে বলতে পেরেছে-

'আমি ন্যায় ছাড়া অন্যায় কিছু করি নাই। ...আমি যদি ঐরকম একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসতুম আর যদি আমার সোয়ামি ঐজন্যে আমাকে কেটে ফেলতো, তাহলে পুরুষেরা একটি কথাও বলতো না। তাদের সঙ্গে মেয়েরাও বলতো, হ্যাঁ, ওরকম খারাপ মেয়েমানুষের ঐ রকমেই মরা উচিত। কারণ তারাও বরাবর দেখে আসছে পুরুষদের সাতখুন মাফ।'[২৫]

-বিন্দির এই যুক্তি আমাদের কবি নজরুলের আধুনিক যুক্তিবাদী নারীর স্বপক্ষে তাঁর উদার মানবিকতাবোধকেই স্মরণ করায়। আসলে, নজরুল তাঁর সময়ের সকল সঙ্কীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে, উদার মানবিকতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে পশ্চাদ্বর্তী অবরোধে আবদ্ধ নারী সমাজের মুক্তি কামনা করেছেন।

নজরুল দেখিয়েছেন যে, ছেলে-মেয়ে-স্বামী নিয়ে বিন্দি যে সুখের সংসার গড়ে তুলেছিল এবং ছেলের বৌ, নাতি-নাতনী ও মেয়ে-জামাই নিয়ে যে 'ইন্দ্রপুরী'র স্বপ্ন দেখেছিল, সেই স্বপ্নে বাধ সেধেছিল তারই সদা মদ্যপ ও চরিত্রহীন স্বামী। বহুভোগ্যা এক পতিতার পরকীয়া প্রেমে স্বামী মন-প্রাণ ঢেলে দিলে, এমনকি বিন্দির পরের বাড়িতে কাজ করে আয় করা টাকাও জোর করে কেড়ে নিয়ে মদ্য পান কিংবা ঐ বহুবল্লভার পায়ে ঢেলে দিলে বিন্দি মাথা ঠিক রাখতে পারে না। তার ভাবী স্বপ্নের এই আশু বিনাশ কল্পনায় সে হয়ে ওঠে বিদ্রোহিণী। তবুও স্বামীকে সে সৎ পথে আনার বহু চেষ্টা করে, কিন্তু সে হয় ব্যর্থ। শেষে নিরুপায় হয়ে সে হয়ে ওঠে বিদ্রোহিণী।

স্বীয় পতিকে স্ত্রীর খুন করতে বাধ্য হওয়ার এই যুক্তি নজরুল বাস্তবদৃষ্টি দিয়েই দেখেছেন। তাইতো পুরুষশাসিত সমাজের বিরুদ্ধে গল্পকার নজরুল-সৃষ্ট বিন্দির যুক্তিকে সমর্থন করে, কবি নজরুলও যেন মূর্ত করে তুলেছেন এই বাণী:

"পতি যদি অন্ধ হয়, হে সতী
বেঁধোনা নয়নে আবরণ
অন্ধ পতির আঁখি দেয় যেন
তোমার সত্য আচরণ॥" [২৬]

বিন্দির মনেও জাগে বিপথগামী স্বামীকে নরক যাত্রা থেকে ফেরানোর কর্তব্যবোধের প্রশ্ন-
'আমি তার 'ইস্ত্রি', আমারও তো একটা কর্তব্য আছে, আমার সোয়ামি যদি বেপথে যায়, তো আমি না ফিরালে অন্য কে এসে ফিরাবে? আর সে এইরকম বেপথে গেলে ভগবানের কাছে ধর্মত আমিই তো দায়ী।'[২৭]

কর্তব্যের এই দায়বদ্ধতায় নজরুল বিন্দিকে করে তোলেন যেন প্রতিবাদী রণরঙ্গিনী চণ্ডী। আর এই চণ্ডীর যুক্তিবোধের মধ্য দিয়ে কবি নজরুল যেন তাঁর ব্যক্তিত্বময়ী আধুনিক নারীর স্বাধিকার অর্জনের কল্যাণমন্ত্রই শোনাচ্ছেন:

"যে ঘোমটা তোমা করিয়াছে ভীরু
ওড়াও সে আবরণ।
দূর করে দাও দাসীর চিহ্ন
যেথা যত আভরণ।"[২৮]

-নজরুল বিন্দির মন থেকে সমস্ত দাসীত্বের চিহ্ন-আভরণ মুছে ফেলে স্বামীর অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাকে করে তোলেন- অগ্নি-নারী, যেন শাণিত তরবারি। স্বামী হত্যার অপরাধে বিন্দিকে জেল খাটিয়ে এবং স্বামীকে নরকযাত্রা থেকে রক্ষা করিয়ে সামাজিক দৃষ্টির বিচারকে মাথা পেতে নিতে বিন্দিকে নজরুল উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই অনুপ্রেরণা জোগান। আসলে, ত্যাগে-তিতিক্ষায়, পারিবারিক বন্ধনে নারীর মানবিক শ্রেষ্ঠত্বকে নজরুল অনেক ঊর্ধ্বে ঠাঁই দিতে চেয়েছিলেন। তাই দাম্পত্য প্রেমে নারীর বিদ্রোহী চেতনাতেও নজরুলের কবি-আত্মা যেন ঘোষণা করে,- ’পাপে নয়, পতি পুণ্যে সুমতি/থাকে যেন, হয়ো পতির সারথি।’

নজরুলের বিদ্রোহী মন যে কোনো সামাজিক অকল্যাণের বিরুদ্ধে সোচ্চার। তাই তাঁর বিশ্বাস, স্বামীর চরিত্রহীনতা ও ব্যভিচারকে প্রশ্রয় দিতে গিয়ে পাপের লেলিহান শিখায় ভস্মীভূত হয়ে কিংবা spirit বিহীন form-এর যূপকাষ্ঠে পুরোহিতের বাঁধা বুলিকে বিশ্বাস করার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় না নারীর মহিমা। কঠোর কর্তব্য ও নিষ্ঠার ভিতর দিয়ে আত্মসম্মান ও দায়িত্ববোধের প্রতি সজাগ হয়ে স্ত্রীরূপে স্বামীর কর্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত করার মধ্যেই নারীত্বের বিকাশ লাভ সম্ভব হয়।

-রবীন্দ্রনাথের পর বিংশ শতকে কল্লোলের কবিগোষ্ঠী পশ্চিমী বিশ্বের মতোই বিচিত্র চমক সৃষ্টি করেছেন। এঁরা জীবন প্রত্যয়ের উচ্চাবচ পথে বিচরণ করলেও সমভূমি থেকেই জীবনকে প্রত্যক্ষ করেছেন। সে সমভূমি হল মানুষের প্রতি বিস্ময় মিশ্রিত ভালবাসা। কল্লোল গোষ্ঠীর কবি নজরুলের সমাজ বাস্তবতা গল্পকার নজরুলকেও প্রভাবিত করে। অবশ্য কোনো সৃষ্টিই বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর আদর্শের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি হতে পারে না। শিল্পীর সৃষ্টি চলে তাঁর আপন ব্যক্তিত্বের স্বভাব খেয়ালেই। নজরুলের গল্পগুলি লিবিডোরাগিনীর অক্টোপাস বেড়ে জড়িত থাকলেও সেগুলিতে তাঁর কবি- আত্মার প্রতিফলন স্পষ্ট। রোমান্টিক কবির বিষাদপূর্ণ ধ্যানতন্ময়তায় গল্পগুলি প্রায়ই শিথিল ও বাস্তব সংস্পর্শ থেকে দূরবর্তী হতে দেখা গেছে। কিন্তু নজরুলের অস্তিবাদে বিশ্বাসী মনটি আমাদের স্মরণ করায় দর্শনের সর্বাস্তিবাদ। যার মূল কথা জীবেনের সব কিছুই আছে, সব কিছুকেই গ্রহণ করতে হবে। সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি ও বেদনার ঊর্ধ্বে মানুষকে প্রত্যক্ষ করতে হবে। কবি নজরুল তাঁর নিজস্ব মনোবোধ থেকেই তাঁর বাস্তব সমাজের মাটি থেকে উত্থিত জীবন জিজ্ঞাসাকে তুলে এনেছেন।

গল্পকার নজরুলে, বিশেষ করে তাঁর ‘রাক্ষুসী’ গল্পে বিন্দির জীবন জিজ্ঞাসায় বিদ্রোহী সত্তার প্রকাশ লক্ষ্য করে আমরা অবাক হয়ে যাই। কেননা, এই গল্পটি নজরুলের শিথিল ও বাস্তব সংস্পর্শহীন গল্পগুলি থেকে স্বতন্ত্র। আজকের মানুষ সঙ্গতিহীন জীবনের অর্থহীন পরিণামের দিকে ভেসে চলেছে। ছোটগল্পে ‘অকারণ- অবারণ’ চলা যদি ফুটে ওঠে, তাহলে লেখক-পাঠক উভয়েই এই ভেবে আশ্বস্ত হয় যে, গল্প ও জীবন সমান্তরাল রেখায় বইছে না, একে অপরের উপর আপতিত হয়েছে। বিন্দির সহজ সরল জীবনেও বিদ্রোহিনী সত্তার আরোপ করে গল্পকার নজরুল বাস্তব জীবন জিজ্ঞাসাকেই দাম্পত্য প্রেমের সূত্রে অনেকটাই শিল্পসম্মত করে তুলতে পেরেছেন। বিন্দির ব্যভিচারী স্বামীকে হত্যা করেও তার প্রতি বিস্ময়মিশ্রিত ভালবাসা আরোপ করে নজরুল দাম্পত্য প্রেম-চেতনায় তাঁর জীবন-জিজ্ঞাসাকে বাস্তবধর্মী জীবন জিজ্ঞাসায় উন্নীত করতে শিল্পসম্মতভাবেই সফল হয়েছেন।

আর এখানেই আমরা দেখি কবি ও গল্পকার নজরুলের প্রেম চেতনা তাঁর শিল্পী আত্মার মিলেমিশে একাত্ম হয়ে উঠেছে দাম্পত্য প্রেমের মহিমায় মহিমান্বিত মধুমিশ্রা।

তথ্যসূত্র:

1) ‘পাপ’, ‘স্বপ্ন পসারী’- কাব্যগ্রন্থ মোহিতলাল মজুমদার।
2) অ-নামিকা’: ‘সিন্ধু হিল্লোল’ -কাব্যগ্রন্থ -কাজী নজরুল ইসলাম।
3) ‘এ মোর অহংকার’: ‘চক্রবাক’ কাব্যগ্রন্থ নজরুল ইসলাম।
4) ‘স্বামীহারা’: ‘নজরুল গল্প সমগ্র’ ‘সাহিত্যম’ পৃষ্ঠা -১৩৫ থেকে ১৩৬।
5) ‘বিবাগিনী’: ‘দোলনচাঁপা’ কাব্যগ্রন্থ ডি.এম. লাইব্রেরী ১৯৮৯।
6) ‘স্বামীহারা’: ‘নজরুল গল্প সমগ্র’ ‘সাহিত্যম’, পৃষ্ঠা -১৪১।
7) ‘পূজারিনী’: ‘দোলনচাঁপা’ কাব্যগ্রন্থ।
8) ‘১০৬’, আপার চিৎপুর রোড গ্রামোফোন রিহার্সাল রুম থেকে ০১-০৭-১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের নার্গিসের দেওয়া এক পত্রের নজরুলের প্রত্যুত্তর: সূত্র ‘বাংলা সাহিত্যের নজরুল’– আজহারউদ্দিন খান। সুপ্রিম পাবলিশার্স প্রথম সংস্করণ ১৯৯৭,পৃষ্ঠা -৭৬।
9) ’তুমি কি গিয়েছো ভুলে?’- ‘নতুন চাঁদ’ কাব্যগ্রন্থ সূত্র- কাজী নজরুল ইসলামঃ‘ জীবন ও সৃষ্টি’ ডক্টর রফিকুল ইসলাম। পৃষ্ঠা- ৫১১।
10) ‘নজরুল গীতি- রাগ বিচিত্রা’। সূত্রঃ ‘নজরুল রচনা সম্ভার’ চতুর্থ খন্ড, আব্দুল আজিজ আল্ আমান্ সম্পাদিত ও হরফ প্রকাশনী। পৃষ্ঠা -১৭৩
11) ‘পদ্মগোখরোঃ’ ‘নজরুল গল্প সমগ্র’ ‘সাহিত্যম’। পৃষ্ঠা -১৫৮।
12) ‘দারিদ্র’: ‘সিন্ধু হিন্দোল’ কাব্যগ্রন্থ। সূত্রঃ ‘নজরুল দর্শন’ কবীর চৌধুরী ঢাকা থেকে প্রকাশিত ১৯৯২, নজরুল শতবার্ষিকী বক্তৃতামালা প্রকাশনা-৩, পৃষ্ঠা- ৫৯।
13) ‘পদ্মগোখরো’– ‘নজরুল গল্প সমগ্র’ ‘সাহিত্যম,’ পৃষ্ঠা -১৫৭।
14) ‘সাহিত্যে ছোটগল্প’– নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।
15) ‘বিষের বাঁশি’ কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গ অংশ- ‘বাংলার অগ্নিনাগিনী মুসলিম মহিলা কুল গৌরব আমার জগত জননী স্বরূপা মা মিসেস এম রহমান সাহেবের পবিত্র চন্দ্র চরণার বিন্দে‘।
16) অধ্যাপক বন্ধু কাজী মোতাহার হোসেনকে লেখা নজরুলের পত্রাংশ, সূত্র- ‘নজরুল প্রেম সম্ভার’ প্রথম সংস্করণ --১৯৮৯, পৃষ্ঠা -১২৯।
17) ‘সাহিত্যে ছোটগল্পঃ’ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পৃষ্ঠা- ২৭৭, ২৭৮।
18) ‘রাক্ষুসী’ ‘নজরুল গল্প সমগ্র’, ‘সাহিত্যম’ পৃষ্ঠা- ১২২।
19) ‘রাক্ষুসী’ ‘নজরুল গল্প সমগ্র’, ‘সাহিত্যম,’ পৃষ্ঠা -১২২।
20) ‘নজরুলের কাব্যগীতিঃ’ ‘নজরুল রচনা সম্ভার’ ষষ্ঠ খন্ড, আব্দুল আজিজ আল্ আমান্ সম্পাদি্ হরফ্ প্রকাশনী, পৃষ্ঠা -১২৩।
21) ‘নজরুল গীতিঃ’ ‘বিদ্রোহী বিচিত্রা’, সম্পা্দনায় – আব্দুল আজিজ আল আমান, হরফ প্রকাশণী, ২য় সংস্করন-১৯৮৯।
22) ‘রাক্ষুসি’ ‘নজরুল গল্প সমগ্র’ ‘সাহিত্যম’ পৃষ্ঠা -১১৯।
23) ‘রাক্ষুসী’ ‘নজরুল গল্প সমগ্র’, ‘সাহিত্যম’ পৃষ্ঠা -১২৫।

24) ‘বুলবুল’ (২য় খণ্ড) কাজী নজরুল ইস্‌লাম:
সূত্রঃ- ‘ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস’ এ কে এম আব্দুল আলিস। বাংলা একাডেমি, ঢাকা সংস্করণ- ১৯৭৩, পৃষ্ঠা -১৪৭।

25) ‘রাক্ষুসী’ ‘নজরুল গল্প সমগ্র’, সাহিত্যম, পৃষ্ঠা- ১২৩-১২৪।

26) ‘বধূবরণ’: ‘সিন্ধুহিন্দোল’ কাব্যগ্রন্থ, কাজী নজরুল ইস্‌লাম।

27) ‘রাক্ষুসী’: ‘নজরুল গল্প সমগ্র’ ‘সাহিত্যম’ পৃষ্ঠা- ১২২।

28) ‘নারী’- ‘সাম্যবাদী’- ‘সর্বহারা’- কাব্যগ্রন্থ কাজী নজরুল ইস্‌লাম।